বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশ

মোঃ হাসিবুর রহমান*

১.১ ভূমি আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি

বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা এক যুগের বা এক শতাব্দীর কার্যক্রমের ফল নয়। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতার আলোকে ভূমি ব্যবস্থাপনা কাঠামো বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছেছে। ভূমি আইনের সূচনা হয় বৃটিশ আমল থেকে। ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল টেনান্সি এ্যাক্ট, এর আগে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৮৫৮ সালের রেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৯০-১৯৪০ সময় ব্যাপী ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে বা সিএস খতিয়ান তৈরি এবং ১৯৩৮ সালের বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিন্যু বা ফ্লাউড কমিশনের কার্যক্রম এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ফ্লাউড কমিশন ১৯৪০ সালে রিপোর্ট পেশ করে। সেটা সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্য ১৯৪৪ সালে বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এনকোয়ারী কমিটি গঠিত হয়। জমিদার কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনার কোনো উন্নয়ন নয় বরং তাদের মাত্রাতিরিক্ত ভোগ বিলাস এবং সীমাহীন স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে এই কমিটি ফ্লাউড কমিশনের সাথে ঐক্যমত পোষন করেন। বলতে গেলে জমিদারী প্রথার বিলোপ তথা প্রজাস্বত্ত্ব আইনের বীজ যেন এর মধ্যেই নিহিত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে বাংলার কৃতী সন্তান শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর নেতৃত্বে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন প্রণীত হয় যা পরবর্তী কালের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইনের ভিত্তি প্রস্তর।

১.২ প্রাগৈতিহাসিক আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনা

মনুসংহিতা থেকে জানা যায়, জঙ্গল পরিষ্কার করে যে আবাদী জমি তৈরী করত, সেই হতো জমির দখলদার। সম্রাট অশোকের সময় কৃষির আয় হতে রাজস্ব হিসেবে গ্রহণ করা হতো এক দশমাংশ। রাজার অংশই হচ্ছে রাজস্ব। তখনকার সময়ে কৃষক, গ্রামীন সমাজ এবং রাজশক্তি এই তিনটি শক্তিকে কেন্দ্র করেই সমাজ ব্যবস্থা আবর্তিত হতো।

১.৩ মুসলিম আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনা

১২০১ সালে রাজা লক্ষণ সেনের পরাজয় অর্থাৎ মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পর হতেই বাংলার কিছু এলাকায় শুরু হয় মুসলিম শাসন। শুরু হয়

---

*পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

সুলতানি আমল। মুসলিম সুলতানগণ মনসবদার রাখতেন। তাঁদের অধীনে থাকত পদমর্যাদা অনুযায়ী সৈন্য এবং সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য দেয়া হতো লাখেরাজ জমি। বিভিন্ন ধরণের লাখেরাজ জমি ছিল। যেমন আলতামাঘা লাখেরাজ আলশাঘা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি লাল সীলমোহরের নাম। ঐ সীলমোহর অঙ্কিত কাগজে লাখেরাজ দেয়া হতো তাই আলতামাঘা লাখেরাজ। আয়মা লাখেরাজ - এই ধরণের লাখেরাজ জমি সাধারণত ধর্মীয়গুরু বা উপদেষ্টাদের বরাদ্দ দেয়া হতো। এর বিনিময়ে তাঁরা প্রয়োজনের সময় সুলতান বা বাদশাহ্ কে বিভিন্ন তথ্য বা পরামর্শ দিতেন; যা ছিল তাঁদের জীবিকা-উপার্জনের উপায়। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা সেনাপতিদের বরাদ্দ দেয়া হতো লাখেরাজ জায়গীর। তাঁদের বলা হতো জায়গীরদার। ইসলাম ধর্ম প্রচারকদেরকে যে লাখেরাজ জমি বরাদ্দ দেয়া হতো তাকে বলা হতো মাদাদ্‌মাশ। মসজিদ পরিচালনার জন্য যে লাখেরাজ জমি বরাদ্দ দেয়া হতো তার নাম ছিল নাজারাত এবং দরবেশ বা সাধু-সন্তুদের জন্য লাখেরাজ জমির নাম সায়রখাল।

১.৪ জমিদারী প্রথার প্রবর্তন

১৬৫০ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি। ফলে তখন কারো অভাব ছিল না। জমি ছিল খুবই উর্বর। জমিদারী প্রথা ইতোপূর্বেও ছিল তবে তেমন বিধিবদ্ধ ভাবে নয়। বেশীর ভাগ রাজা বাদশাহগণই রাজ কর্মচারী দিয়ে সরাসরি খাজনা আদায় করতো। তবে ইংরেজ আমলেই চিরস্থায়ী, ২ সালা, ৫ সালা এবং ১০ সালা প্রভৃতি বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারী ব্যবস্থার পত্তন করা হয়, যা ছিল অনেকটা ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক আদলে গড়া। নবগঠিত এই মধ্যস্বত্ত্বভোগী সামন্ত শ্রেণী নিজ নিজ স্বার্থেই ইংরেজের চাটুকার এবং নানা প্রকার অন্যায়ের-অবিচারের দোসর হিসেবে কাজ করেছে।

১.৫ সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী, শেরশাহ ও সম্রাট আকবরের আমলে ভূমি সংস্কার

সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৩৫৭-৮৯ সময় পর্যন্ত সিকান্দার শাহ যে জরিপ প্রচেষ্টা চালান সেটাই প্রথম জরিপ, যদিও তা তেমন বিজ্ঞান সম্মত ছিল না। গজ দিয়ে জমি মাপা হতো। যা থেকে সিকান্দরী গজ কথাটি প্রচলিত হয়েছে। শের শাহ - এর আমলে কবুলিয়ত ও পাট্টা ব্যবস্থার প্রচলন হয়। রাইয়ত বা প্রজারা রাজাকে বা জমিদারকে দিত কবুলত যাতে থাকতো জমির হিসাব ও খতিয়ান আর জমিদার প্রজাকে দিত পাট্টা যাতে থাকতো নির্দিষ্ট খাজনার পরিমাণ। এ সময় থেকেই খতিয়ান ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। শের শাহ - এর আমলে চাক্‌লা, পরগনা এবং গ্রাম এই তিনটি

পর্যায়ে জমিদারী ভাগ করা হতো। চাকলাদার ছিল চাকলার মালিক। চাকলার অধীনে ছিল জমিদারদের পরগনা। পরগনার অধীন ছিল অনেক গ্রাম। চাকলার জমিদার অর্থাৎ বড় মাপের জমিদার বা ভূস্বামীদের সাথে রাজার সরাসরি যোগাযোগ থাকতো। সম্রাট আকবরের আমলে উপমহাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় আরও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জন্য তিনি রাজা তোডরমল এর নিকট বহুলাংশে ঋণী। রাজা তোডরমল ইতোপূর্বে শের শাহের অধীনে দায়িত্ব পালন করে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

১.৬ পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী দেওয়ানী আমল

১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট আওরঙ্গজেব - এর পৌত্র সম্রাট শাহ্ আলম - এর নিকট হতে ইংরেজগণ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে বাংলা - বিহার - উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ান হতে নায়েব নাজিম নিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ খাজনা আদায় ও বিচারের ভার দুইই তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হলো। এরপর ওয়ারেন হেস্টিংস এর সময় নায়েব নাজিম - এর কাজকর্ম তদারক করার জন্য ইংরেজ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। এই সুপারভাইজার পদেরই বিবর্তিত রুপ এক সময়ের কালেক্টর বা বর্তমানের রেভিন্যু কালেক্টর।

১.৭ আমীর ও দেওয়ানের দ্বারা খাজনা আদায় এবং Pit’s India Act

১৭৭৩ সালে পূর্বোক্ত কালেক্টর পদ বিলোপ করা হয়। ধারণা করা হয়েছিল যে তারা কৃষকদের প্রতি সদয় ছিলেন। ফলে খাজনা আদায় হতো কম। তাই পুণরায় ১৮১৯ সাল থেকে আমীর ও দেওয়ানদের দ্বারা খাজনা আদায় করা শুরু হলো। অবশ্য ১৭৮১ তে কালেক্টর এর পদ আবার প্রবর্তিত হয় কিন্তু তাদের দায়িত্বের প্রকৃতি পাল্টে যায় এসময় তাদের দায়িত্ব হলো আদালতের বিচার কার্য সম্পাদন। পুলিশ ফৌজদারী বিচারকার্য পরিচালনা করতো এবং কালেক্টর দেওয়ানী আদালত পরিচালনা করতো। ইতোমধ্যে Pit’s India Act পাশ হলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার একই বিচারক পরিচালনা করতে পারতেন।

১.৮ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন

১৭৯০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত ছিল ১০ সালা বন্দোবস্ত। ঠিক এর মধ্যেই (১৭৯৩ সালে) লর্ড কর্ণওয়ালিস লন্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর - এর অনুমোদনক্রমে এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। এর ফলে এতদিন যে কৃষকগণ ছিলেন দখলকৃত জমির স্বাধীন মালিক তারা পরিণত হলেন স্বত্বহীন এবং পরাধীন প্রজায়। এই ব্যবস্থায় জমিদারকে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সূর্যাস্তের পূর্বেই জমিদারীর জন্যে দেয় খাজনা পরিশোধ করতে হতো। অপারগতায় জমিদারী নিলামে চড়তো। বন্দোবস্তের শর্তের বাইরে কোনো প্রকার কর আদায় করা যেত না। কর না দিলে গরু, লাঙ্গল

প্রভৃতি আটক করা হতো। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ ক্ষুব্ধ হয়। ফলে ১৭৯৫ সালে সরকার জমিদারদের পক্ষে বেশ কিছু ছাড় প্রদান করেন।

১.৯ রেন্ট এ্যাক্ট

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে বছর ক্ষমতায় এলেন সেই বছরই অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে রেন্ট এ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনের ফলে একজন প্রজা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তখন থেকে আদালতের রায় ব্যতীত প্রজাকে তার বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা যেত না, পাট্টা কবুলিয়তের শর্ত কার্যকরী হলো, জুলুম করে অতিরিক্ত কর আদায় করা যেত না, খাজনা গ্রহণের রশিদ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হলো।

১.১০ রেন্ট কমিশন ও বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাক্টঃ

১৮৭৯ সালে রেন্ট কমিশন গঠিত হয়। ১৮৮০ সালে এই কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। এরপর ১৮৮৫ সালের ১৪ই মার্চ লন্ডনের আইন সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাশ হলো। এর শর্তানুযায়ী ১২ বছর দখলে থাকলে প্রজাকে ঐ দখলী স্বত্ত্ব থেকে উচ্ছেদ করা যেত না। এই আইন পাশ হওয়াতে প্রজারা জমির সম্পূর্ণ মালিক না হলেও তারা জমি হস্তান্তর করতে পারত এবং ওয়ারিশসূত্রে মালিক হতে পারত। শুধু বড় বড় গাছ কাটতে পারতো না।

১.১১ সিএস, এসএ, এবং আরএস খতিয়ান, ভূমি জরিপ ও স্বত্ত্বলিপি

১৮৮৮ হতে ১৮৮৯ পর্যন্ত চট্টগ্রামের রামুতে পরীক্ষামূলক ভূমি জরিপ হয়। তারপর ১৮৯০ হতে ১৮৯৪ পর্যন্ত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে পরিচালিত হয়। জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইনের পরে হয় এসএ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে হয় আরএস খতিয়ান। অনেক স্থানে যা এখনো সম্পন্ন হয়নি। যেমন, সিলেট, কুমিল্লা, নওগাঁ, দিনাজপুর প্রভৃত স্থানে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এটি সম্পন্ন হয়নি বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অসহযোগিতার জন্য।

১.১২ জমা বিভক্তিকরণ, জমা একত্রিকরণ, স্বত্ত্বলিপি, নামজারি, মিসকেস ও বুজারাত

একই দাগ নম্বরে আলাদা আলাদা মালিকের খতিয়ান আলাদা করার নাম জমা বিভক্তিকরণ। আর একই মৌজার বিভিন্ন দাগের খতিয়ান (একজন মালিকের) যদি বিভিন্ন নম্বরে থাকে তবে সেগুলো একই খতিয়ান নম্বরে আনার নাম জমা একত্রিকরণ। একটা দাগে কোনো লোকের জমি নিয়ে বিরোধ লাগলে ঐ দাগে কার জমি কতটুকু তা কানুনগো পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দেন ও বুঝিয়ে দেন। জমি কমবেশী থাকলেও তখন ধরা পড়ে। ঐ দাগে কোন খতিয়ানে কোন মালিকের কতটুকু জমি

আছে স্বত্বলিপিতে তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। এই বুঝিয়ে দেওয়ার নামই বুজারাত। নাম খারিজ করার পর যে মাঠ পর্চা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় খসড়া স্বত্বলিপি। এটা চুড়ান্তভাবে ছাপানোর আগে কোন গরমিল সংশোধনের জন্য থানা ভূমি অফিসে মিসকেস করা যায়; ছাপানো হয়ে গেলে তখন আর জমি কমবেশী হলে কানুনগোর নিকট আপিল করা চলে না। সে অবস্থায় দেওয়ানী আদালতে স্মরণাপন্ন হতে হয়। নামজারী - দরখাস্ত মুলেও হয়, আবার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত তথ্য থানা ভূমি অফিস এবং জেলা রেভিনিয়্যু অফিসে প্রেরণের পর দলিলে উল্লেখিত তফসিল ভূমি অফিসের রেজিষ্ট্রারের তফসিলের সাথে মিলে গেলে আপনিও হয়। তবে এতে সময় বেশি লাগে।

১. ১৩ মৌজা ম্যাপ

বড় বড় মৌজায় একাধিক নক্শা থাকতে পারে তবে ছোট মৌজায় একটাই নক্শা থাকে। ডিজিএলআর অফিস বা মহা-পরিচালক ভূমি রেকর্ড অফিস এই নক্শা তৈরি করে থাকে। সারা বাংলাদেশে মোট ৮৫,৬০৮টি মৌজা আছে। মৌজা জরিপে নদী ও পাহাড়ী এলাকা বাদ দেয়া হয়।

১.১৪ মৌজা ম্যাপ তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও টেকনিক্যাল বিষয়াদি

জরিপ কর্মীরা থিউরেব্রাইন মেশিন দিয়ে প্রথমে ট্র্যাভার্স সার্ভের মাধ্যমে মৌজার পেরিফেরিটা বের করে। তারপর খাকা নামক এক ধরণের কাগজে সীটে সেটা ওঠায়। পয়েন্টগুলো সরলরেখা টেনে টেনে যোগ করে। এক চেইন = ৬৬ ফুট = ২২ গজ = ১০০ লিংক, ১ লিংক = ৬.৬২ ইঞ্চি। উত্তাপে লিংটি একটু এদিক ওদিক হলেই মাপে ভুল হবার আশঙ্কা থাকে। চেইনটি প্রতিদিন মেপে দেখতে হয় ঠিক আছে কিনা। ট্র্যাভার্স ষ্টেশনগুলির মধ্যে ২ চেইন দুরে দুরে দাগ দিতে হয়। গোল শুন্য দাগকে বলা হয় চান্দা। ভাগগুলোকে বলা হয় মোরব্বা। মোরব্বা কম্পাস দিয়ে মেপে ফিল্ড বুকে উঠানো হয়। পি-৭০ সীটে উঠিয়ে তারপর ডিভাইডার (ডিভাইডার বা কম্পাস কাটার ফোটার ভেতরে তিন মিটার জায়গা থেকে যায়, এর মীমাংসা বদর আমিন, সদর আমিন এবং চেইন ম্যান - এর হাতে থাকে। এই তাদের অলিখিত ডিসক্রেশনারী ক্ষমতা। পুরানো গাছ, আগের মাপ প্রভৃতি গ্রামের প্রবীণ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে ঝগড়ার মীমাংসা করতে হয়) দিয়ে ফিল্ড বুকে উঠানো হয়। এভাবে কিস্তোয়ার মোরব্বা করা অর্থাৎ ক্ষেত্র বানানো হয়, এরপর আইল চিহ্নিত অবস্থায় ম্যাপে উঠে যায়।

খানাপুরী হল শুন্যস্থান পূরণ বা খতিয়ানে মালিকের নাম বসানো। এই পদ্ধতিতে এক ইঞ্চি জমিও হিসাব হতে বাদ যায় না। দাগগুলির মধ্যে কে কতটুকু মালিক তা সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

১.১৫ বুজারাত ও জমিজমার বিরোধ নিস্পত্তি

নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে এ্যাটেষ্টেশন বা তাস্দিক করতে হয়। কানুনগো তাসদিক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে সব ঠিক থাকলে তাস্দিককৃত বা এ্যাটেস্টেড করে সীলমোহর দিয়ে দেন। তখন জমির মালিকানা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

১.১৬ দিয়ারা জরিপ

নতুন জেগে ওঠা চর এমনি পুরনো চরও নতুন করে জেগে উঠলে এখন আর কেউ আপনা আপনি মালিক হয় না (খাজনা চালু থাকা নদীর নীচের জমি ব্যতিরেকে)। এইসব চরাঞ্চলের দখল নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, সেটেলমেন্ট অফিসার এবং তার অন্যান্য লোকবল সহযোগে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। যদি বিরোধ নিস্পত্তি স্থল দুই জেলার সীমানার মধ্যে পড়ে তাহলে উভয় জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

১.১৭ আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসার এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার

আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসার এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার এর দায়িত্ব আলাদা। দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার পয়স্তি জমি ও দরিয়ার চরে জাগা সিকস্তি জমি জরিপের দায়িত্বে থাকেন যার ভিত্তিতে নতুন জেগে ওঠা জমি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মাধ্যমে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। ইউনিয়ন অফিসের পূর্বের নাম তহশীল অফিস বা কাছারী। প্রতি ইউনিয়নে একটি তহশিল করার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই এই নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। যেহেতু প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হয়নি এবং কোন কোন স্থানে ২/৩ টি ইউনিয়ন - এর জন্যও একটি তহশিল অফিস আছে, সেকারণে পুরনো নামই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

১.১৮ মিস-কেস, এসএ খতিয়ান, তহশিল অফিস, আরডিসি, এসি ল্যান্ড এবং জমি সংক্রান্ত বিরোধের চূড়ান্ত মিমাংসা

মিস-কেস এর কপি আরডিসি (রেভিন্যু ডেপুটি কালেক্টর) এর অফিসে এবং জেলা রেকর্ড রুমেও থাকে। এমনকি ইউনিয়নের তহশিল অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অফিসেও থাকে। ভুল নাম কেটে শুদ্ধ নাম ঐ কাগজে উঠানো হয়। এসএ পরচাকে ঢাকার সাভার অঞ্চলে পাথাইলা পরচাও বলে । এতে কার আইল কতদুর তা ঠিক করে জমি সংক্রান্ত বিবাদের মিমাংসা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করে দেখা গেছে সহকারী কমিশনার (ভূমি) - এর অফিস হতে মিস-কেস নাম তহশিল অফিসের রেজিস্টারে শুদ্ধ হলেও জেলা রেকর্ড রুমের এসএ খতিয়ানে ভুল নাম রয়ে গেছে। বিধি মোতাবেক এটি ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তাই এসএ খতিয়ান - এ নাম থাকলেই জমির মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া

যায় না। তহশিল অফিস, সরেজমিনে দখল এবং ১২বছরের মালিকানা বিষয়ে তথ্য নিয়ে এবং সবশেষে আরএস খতিয়ান দেখে জমি কিনতে হয়। কারণ এসএ খতিয়ানের ভুল নাম মিস কেসের পর এসএ খতিয়ানে শুদ্ধ করা না হলেও পরবর্তী আরএস (ছাপানো) খতিয়ানে শুদ্ধ হয়ে উঠে এসেছে।

১.১৯ বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত রেজিষ্টারসমূহ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা

অন্যান্য অফিসের মত স্বাভাবিক রেজিষ্টারসমূহ ছাড়াও ইউনিয়ন, থানা এবং জেলা ভূমি অফিসে আলাদা কিছু রেজিষ্টার থাকে, যেখানে নানা প্রকার পাওনা আদায়, খাস জমি প্রভৃতি সম্পর্কিয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। ১ নম্বর রেজিষ্টারের ১ নম্বর খতিয়ানে থাকে খাস জমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। জমি পয়স্তি হলে বা নদীতে চর জাগলে, নদী বা সমুদ্রে জমি পয়োবৃদ্ধি হলে বা কিনারা হতে বাড়তে থাকলে, সরকার জমি নিলামে কিনলে, কেউ জমি অনাবাদি রেখে ৫ বৎসর খাজনা না দিলে সে সম্পত্তিও পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে সরকারি বলে গন্য হবে। জনগনের ব্যবহৃত রাস্তা, খাল, ঘাট ইত্যাদিও পূর্বোক্ত খতিয়ানে থাকে। এসব থেকে প্রাপ্ত আয় অন্য রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ৩৬৮ মোতাবেক ৮ নম্বর রেজিষ্টারটির চারটি ভাগ আছে - ১) রাস্তা, হালট্, পানীয় জলের কূপ, বাঁধ, খালবিল, নদীনালা যা সর্বসাধারণ ব্যবহার করে এবং ৬০ বছরের অধিক সময় যাবৎ ব্যবহার করে আসছে এমন জমি ২) বন্দোবস্ত উপযোগী কৃষি ও অকৃষি জমি, ৩) নিলাম খরিদা, পরিত্যক্ত বা সরকারি জমি, ৪। পয়স্তি বা নদীতে চর জেগে ওঠা খাস জমির বিবরণ। IX নম্বর রেজিষ্টারটি নাম জারি রেজিষ্টার, এর দুটি খন্ড থাকে। ৯ নম্বর রেজিষ্টারটি সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত। এটি রোমান নম্বর দ্বারা চিহ্নিত। II নম্বর রেজিষ্টার হচ্ছে তলব বাকি রেজিষ্টার (অর্থাৎ কোন জমির মোট খাজনা কত, কত আদায় হয়েছে এবং কি পরিমাণ বাকি আছে) এতে ১ নম্বর অর্থাৎ খাস খতিয়ানের জমি থাকে না। III নম্বরটি খাজনা আদায় রেজিষ্টার। এই রেজিষ্টার তহশিল অফিসে থাকে। IV নম্বর রেজিষ্টার হচ্ছে ক্যাশ বহি যা থানা ভূমি অফিস এবং তহশিল অফিসে থাকে। V নম্বর রেজিষ্টার হচ্ছে ব্যাংক প্রদত্ত পাশ বহি, এটাও থানা ভূমি অফিস এবং তহশিল অফিস কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। VI নম্বর রেজিষ্টার হচ্ছে বিবিধ দাবি আদায় রেজিষ্টার (সায়রাত মহাল, পাথর মহাল প্রভৃতি পাওনা এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়) VII নম্বর রেজিষ্টারটি দৈনিক বিবিধ আদায়ের জন্য এবং VIII নম্বর বিশিষ্ট রেজিষ্টারটি হচ্ছে সরকারের দখলীয় ভূমির রেজিষ্টার।

X নং রেজিষ্টার ভূমি বন্দোবস্ত দেবার রেজিষ্টার, XI নম্বর রেজিষ্টার - খাজনা বৃদ্ধি, মওকুফ বা হ্রাস সংক্রান্ত রেজিষ্টার। এই রেজিষ্টার জেলা অফিসে সংরক্ষিত থাকে। XII নম্বর রেজিষ্টার - খাস জমি বন্দোবস্ত দেবার প্রস্তাব এর রেজিষ্টার, এটাও জেলা অফিসের রেজিষ্ট্রার। XIII নম্বর রেজিষ্টার মিস কেস এর রেজিষ্টার,

XVI রেজিষ্টার লোকাল ইনকোয়ারী রেজিষ্টার, XVII নং রেজিষ্টার ট্রেজারি চালান এর রেজিষ্টার, XXXII নম্বরটি সিকিউরিটি রেজিষ্টার, XXXIIII নম্বর রেজিষ্টারটি অফিসের স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্টার এবং XXVI নম্বর রেজিষ্টারটি পরিদর্শন বহি। এছাড়া অন্যান্য রেজিষ্টারসমূহ ইংরেজি হরফে লেখা। 40 নম্বর রেজিষ্টার - এটা শুধু সিকস্তির কারণে বা খাস সম্পত্তি বন্দোবস্ত, নিলাম খরিদ, পরিত্যাক্ত ইত্যাদি কারণে ব্যবহৃত হয়। এবং ৯৪ নম্বর রেজিষ্টারটি হচ্ছে চেক বই রেজিষ্টার।

তহশিল অফিসের বিভিন্ন ধরণের রিটার্নসমূহ

১নং রিটার্ন - বাৎসরিক সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রতিবেদন (দাবি, আদায়, মিনা মওকুফ ও বকেয়া);

২নং রিটার্ন - দাবি ও আদায়ের পাক্ষিক প্রতিবেদন;

৩নং রিটার্ন - অনাদায়ী দাবির তালিকা।

১.২০ জমির স্বত্ব প্রকরণ

যে সমস্ত ওয়াকফ, দেবোত্তর, ট্রাস্ট সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা হয় নাই সে সমস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সরকার এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন এবং এর থেকে প্রাপ্ত আয় সুবিধাভোগীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না থাকলে বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করেন। পরিবারের সমস্ত সদস্যদেরকে একটি একক হিসেবে গন্য করে এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। প্রজাস্বত্ব আইন স্বাধীন জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য তৈরি বৃটিশ আমল থেকে শুরু হয়ে ১৯৫০ সালে শেষ হলেও এর বিভিন্ন ধারাসমূহ ১৯৬৩ সাল থেকে কার্যকরী হয়। তখন এসএ স্বত্বলিপি প্রস্তুতের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়।

উপসংহার

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় যে শত্রু সম্পত্তি তৈরি করা হয় তা স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্পিত সম্পত্তি আইনে রুপান্তরিত হয়। আপাতত লীজ দেওয়া স্থগিত রেখে অর্পিত সম্পত্তি আইনে বিষয়টির মিমাংসা চলতে থাকে। এর সাথে জড়িত আছে স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্র শক্তির সহযোগিতার বিষয় অন্যদিকে জড়িত আছে দেশের জনগণের ইচ্ছা, তাদের স্বার্থ ও শান্তি রক্ষার প্রশ্ন। অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের পর কি ব্যবস্থায় এ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা হবে তা এখনো অনেকটা অস্পষ্ট। পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে তা বিবেচিত হবে না অন্য দেশের নাগরিকদের ডেকে এনে তাদের পূর্ব সম্পত্তিতে বহাল করা হবে নাকি অন্য কোনো ব্যবস্থায় সেই সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষের নিকট পরিত্যক্ত সম্পত্তির মত সরকারের তত্ত্বাবধানে বিক্রয় করা হবে তা এখনো অনিশ্চিত বিধায় এই সম্পর্কে জনগণের মনে বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। এসমস্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে এবং দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও শান্তির কথা ভেবেই এ ধরণের জটিল বিষয়ের সমাধান দিতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ, এমাজউদ্দিন (সম্পাঃ), ভূমিসংস্কার (১৯৯২), বুক সোসাইটি, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মিয়া, মোঃ আবদুল কাদের, ম্যানুয়াল, (১৯৯২), ঢাকা।

মিয়া, মোঃ আবদুল কাদের, ভূমি জরীপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, (১৯৯২), ঢাকা।

হক, মোঃ সামশুল, ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা, (১৩৯৬) বই ঘর, চট্টগ্রাম।